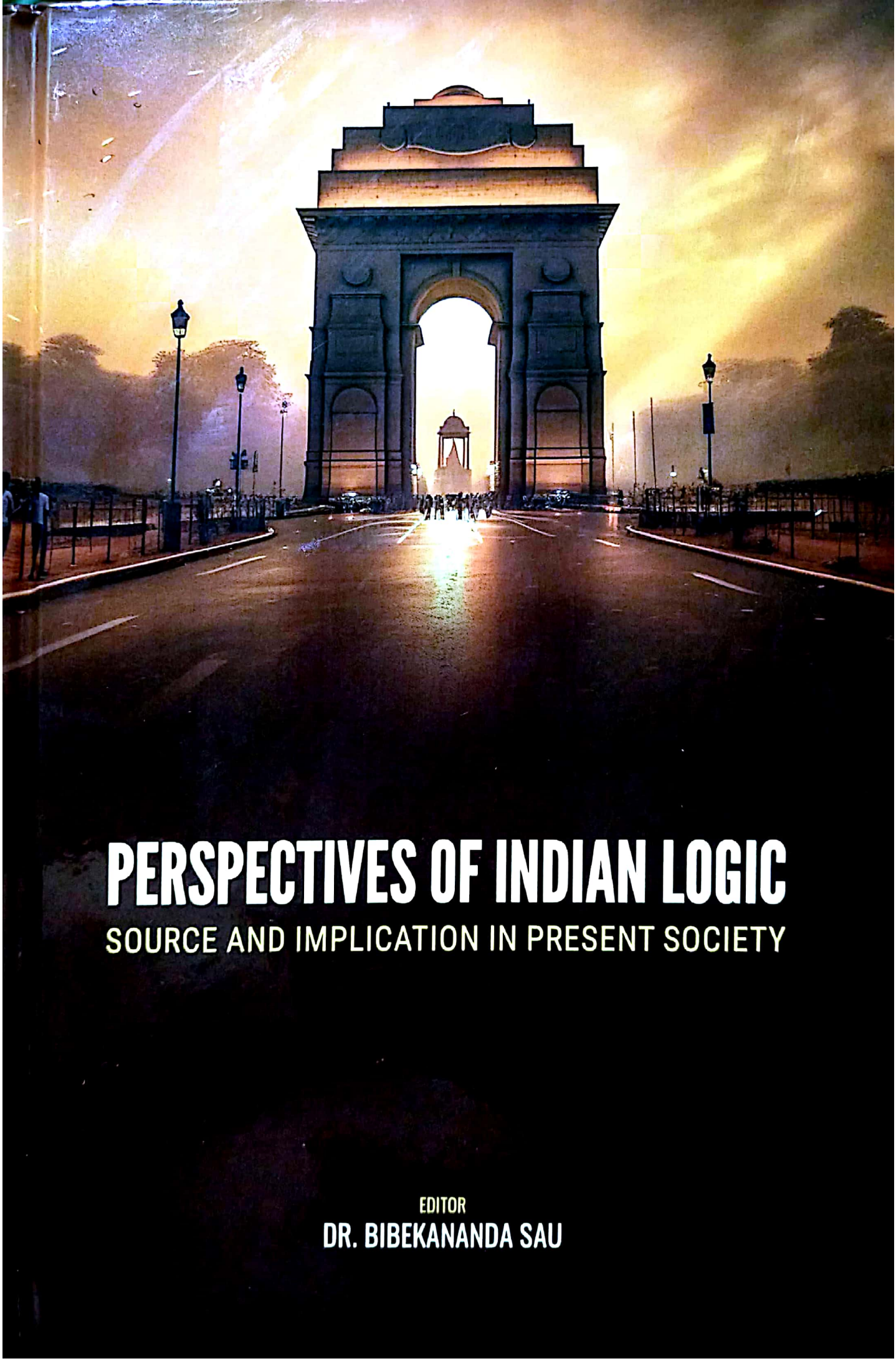

PERSPECTIVES OF INDIAN LOGIC

SOURCE AND IMPLICATION IN PRESENT SOCIETY

EDITOR
DR. BIBEKANANDA SAU

Scanned with CamScanner

CHAPTER NO.	CHAPTERS AND AUTHORS	PAGE NO.
10	বৌদ্ধ দিঙনাগ সম্মত হেতুচক্র ও নৈয়ায়িক উদ্যোতকর কর্তৃক তা খন্ডন সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা *বিবেকানন্দ সাউ*	100
11	অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত অনুমান প্রমাণ *সত্যনারায়ণ জানা*	110
12	জৈন দর্শনে "যুক্তির" ভূমিকাঃ একটি মূল্যায়ন *ডঃ ভরত মালাকার*	114
13	ন্যায়শাস্ত্রে মনঃসংয়োগের ভূমিকা *রাকেশ মণ্ডল*	130
14	হেত্বাভাস- একটি পর্যালোচনা *জয়ন্তী গুপ্ত*	137
15	ভারততত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গির উৎস এবং নিহিত্যঃ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ *ড. সাবিরুল সেখ*	144
16	ভারততত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গির উৎস এবং নিহিত্যঃ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ *ড. সাবিরুল সেখ*	154
17	ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ও বহুত্ববাদের সমাধানে জৈন যুক্তিবিদ্যার ভূমিকা অন্বেষণ *রিমা সাহা*	161
18	ভারতীয় ন্যায় ও তার প্রয়োজনীয়তা একটি প্রতিবেদন *গণেশ দাস*	169

Scanned with CamScanner

Chapter - 16

ভারততত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গির উৎস এবং নিহিত্যঃ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

ড. সাবিরুল সেখ

ভারতবিদ্যা ভারতীয় সমাজের বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত। ইন্ডোলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ ভারতীয় সভ্যতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ধারণা। তত্ত্ব এবং কাঠামোর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকে বোঝার দাবি করে। ইন্ডোলজি হল ভারতীয় সমাজ অধ্যায়ন করার একটি পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু হিসাবে ভারতীয় সমাজের সাথে একটি স্বাধীন শৃঙ্খলা। উভয় কর্মেই ইন্ডোলজি ভাষা, বিশ্বাস , ধারণা, রীতিনীতি, নিষিদ্ধ, প্রতিষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতির অন্যান্য সম্পর্কিত উপাদান গুলি অধ্যায়ন করে। ইন্ডোলজি আন্তঃশৃঙ্খলা, বহু-শৃঙ্খলা এবং ক্রস ডিসিপ্লিনারি পদ্ধতির দাবি করে। ভারতবিদ্যা সমাজ বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন। স্যার উইলিয়াম জোনস্ দ্বারা ১৭৮৪ সালে এটির উৎপত্তির কারণে এটি প্রাচীন ১৯৮৭ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস্ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে তিনি সংস্কৃতি এবং ভারত বিদ্যা দুটি বিভাগ চালু করেন। এটিই হল ভারতে ইন্ডোলজির সূচনা, যা অন্যান্য পন্ডিতদের দ্বারা অনুসরন করা হয়েছে। ভারততাত্ত্বিক সূত্র ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Textual View) বা শাস্ত্রীয় প্রেক্ষিত (textual Perspective) হিসাবে পরিচিত। যেমন শাস্ত্র বলতে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি। ভারততাত্ত্বিক প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে নৃকুল সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আবশ্যক। Ethno Sociology – র উদ্দেশ্য হল কোনও মানব গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির ভাষা ও শাস্ত্র সমূহ থেকে অর্থ ও প্রতিক বা সাংকেতিক ভাষা ও সংক্ষিপ্তসার অনুসন্ধান। এই সময় ভারততাত্ত্বিক প্রেক্ষিত থেকে উল্লেখিত বিষয়গুলি হল যেমন – সামাজিক কাঠামো ও সম্পর্ক সমূহ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, আত্মীয়তাবোধ, মতাদর্শ ইত্যাদি।

ভারতীয় দর্শন, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভারততাত্ত্বিক রচনাসমূহের প্রতিফলন ও পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ভারতীয় সমাজতাবিকদের চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মে। এঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন – ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জী, রাধাকমল মুখার্জী, জি. এস. ঘুরে প্রমূখ ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণায় ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে বিশেষভাবে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ঐশ্বর্যশালী করেছেন। ভারততাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহন করেছেন। ভারতবিদ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জনসাধারণের আচার ব্যাবহারকে পরিচালিত করে। ভারতীয় সমাজতত্ত্বে ভারত বিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে ডুমন্ট ও পোকক বলেছেন "In Principle, a sociology of India lies at the point of confluence of sociology and Indology."

ইরাবতী কারভে তার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় ভারততাত্ত্বিক উপাদানসমূহকে ব্যাপকভাবে ব্যাবহার করেছেন। এম.এন শ্রীনিবাস ও পাণিনির অভিমত অনুযায়ী শ্রীমতি কারভের লেখা গ্রন্থ "kinship Organisation in India (1952)" ভারতের আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

জি. এস ঘুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারততত্ত্বঃ (Ghury Approach towards Indology): ঘুরে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সীমান্তে কমান্ডার হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। তিনি প্রায়শই 'ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানের জনক' হিসাবে প্রশংসিত হয়েছেন। ঘুরে ছিলেন প্রথম সমাজতাত্ত্বিক, যিনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের সমগ্র প্রথম প্রজন্ম গড়ে তুলেছিলেন প্রায় এককভাবে। ঘুরে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক সোসাইটি এবং সমাজতাত্ত্বিক বুলেটিনের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার কৃতিত্বকে সমর্থন করেন। ঘুরে প্রায়শই "তাত্ত্বিক বহুত্ত্ববাদী" হিসাবে স্বীকৃত কারণ তিনি একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতি অধ্যয়নের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজ অধ্যয়নের জন্য অভিজ্ঞতামূলক এবং পাঠ্য বই উভয় পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছিলেন। যেমন- প্রাচীন ভারতীয় যে সমস্ত গ্রন্থ, বেদ, পুরাণ, রামায়ন, উপনিষেধ ইত্যাদি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতাত্ত্বিকদের ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস অনুধাবন করতে হলে অবশ্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। অধ্যাপক ঘুরে ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুধাবন করতে সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন করেন এবং নৃতাত্ত্বিক ধারণাকে কেন্দ্র করে তিনি গবেষণায় উদ্যোগী হন। তিনি অনুধাবন করেন যে, ভারততত্ত্ব (Indology)- র সহায়তা ছাড়া ভারতের জীবন সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন ফলপ্রসূ হবে না। তাঁর মতানুসারে "Indology based on the cultivation of Sanskrit world of literature helps developing the perspective which can be further enriched by the social anthropological outlook." অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যেই ভারততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সামাজিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

অধ্যাপক ঘুরের সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলনের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, ভারততত্ত্বের (Indology) প্রধান ও একমাত্র প্রেক্ষাপট হল সংস্কৃতি ও প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুশীলন এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। অধ্যাপক ঘুরে

Scanned with CamScanner

ভারততত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ লক্ষ্য করেননি। তিনি ভারততত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে একটি বলিষ্ট সংযোজক চিহ্ন অঙ্কন করেছেন এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে কোন প্রকার পৃথকীকরণের পক্ষপাতি ছিলেন না।

ভারতবর্ষের জাতি ব্যাবস্থা (Caste System in India): অধ্যাপক ঘুরের সমাজতত্ত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল ভারতবর্ষে জাতি প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "Caste and Race in India" গ্রন্থে অধ্যাপক ঘুরে জাতি ব্যাবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক ঘুরে তাঁর রচিত "Caste and race in India" গ্রন্থে ভারতের জাতি প্রথা ও বর্ণ ব্যাবস্থাকে নৃবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। তাঁর সমসাময়িকদের মতো তিনি জাতি ব্যাবস্থাকে মহিমান্বিত বা নিন্দা করেন না, বরং তিনি বর্ণকে ভারতীয় সংস্কৃতির পণ্য হিসাবে বিবেচনা করেন, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। অতএব এটি একটি সমাজতত্ত্বের আগ্রহের বিষয়। ঘুরে জাতপাত নিয়ে অধ্যয়ন করেন একজন ভারুতত্ত্ববিদ হিসাবে নয় বরং একজন ইতিহাসবিদ হিসাবে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Caste and Race in India" গ্রন্থে তিনি স্যার হার্বাট রিসলের সাথে সহমত পোষন করে বলেন যে, বর্ণ হল একটি জাতি যা আর্যদের সাথে ভারতে আসে। ঘুরে এটাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন যে জাতিভেদ ব্যাবস্থা বেশিরভাগ সময়েই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়। ভারতীয় ইতিহাসে বর্ণ বিভিন্ন উপায়ের সংমিশ্রণ এবং বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। আর্যরা নিজেদেরকে অনার্যদের থেকে আলাদা করেছিল শুধু গায়ের রঙের দিক থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতিগত গষ্ঠী একে অপরের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আর্য সম্প্রদায় থেকে অনার্য সম্প্রদায়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আর্যরা কখনই নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বা অ-ব্রাহ্মণদের থেকে উচ্চতর জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়নি। আর্য সমাজ নিজেই বিভিন্ন ধরনের পেশা অনুশীলন করত। তাদের পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বর্ণের নামকরন করা হয়েছিল। তাই আর্য সমাজে কৃষক, যোদ্ধা, কারিগর ছিল এবং তাদের সমাজ ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, সংগঠিত এবং প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা। ঘুরে বলেছিলেন যে এটা সত্য যে আর্যদের আবির্ভাবের সাথে ভারতে বর্ণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে, কারণ তাদের জাতিগত চরিত্র ভারতীয়দের থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু আর্যদের আগমনের আগে ভারতে বিভিন্ন জাতিগত শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। ভারত একটি মাত্র জাতিগত গোষ্ঠীর জন্মভূমি ছিলনা। আর্যদের আবির্ভাব ইতিমধ্যে বিদ্যামান জাতিগুলির সাথে আরো একটি জাতি যোগ করে। সেই সময় কোন জাতিই উচ্চ বা নিকৃষ্ট ছিল না। পেশা পরিবর্তন সম্ভব ছিল। তাই আর্যরা অত্যন্ত বিশেষায়িত এবং আদিবাসী হয়ে ওঠে। মানুষ উন্নতির জন্য আর্যদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাই

Scanned with CamScanner

তারা এই উপাদানগুলোকে তাদের জীবনে আত্মসাৎ করতে শুরু করে। শাসকদের আর্যদের গুনাবলি শেখানো হয়েছিল ব্রাহ্মণদের দ্বারা। এই ব্রাহ্মণ সাধুরা অনার্যদের কাছে জাতপাতের মৃত রুপ ছড়িয়ে দেয়। ঘুরে উল্লেখ করেছেন যে আর্য সমাজ শ্রম বিভাজনের সংগঠিত রুপের জন্য বর্ণকে কেন্দ্রীভূত করা হত। যখন আর্য এবং আদিবাসী সম্প্রদায় যোগাযোগ এবং যুদ্ধের মাধ্যমে আন্তঃ ব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তখন আর্য সমাজের সুশৃঙ্খল প্রকৃতি আদিবাসী শাসকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল যারা তাদের সামাজিক জীবনে বর্ণের উপাদানগুলিকে প্রবেশ করান। তাই জাতপাতের উপাদান উত্তর ভারত থেকে দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

অধ্যাপক ঘুরে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভারতে বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেনঃ-

i. Segmental Division (একাধিক খন্ডে বিভাজিত)
ii. Hierarchy (ক্রমোচ্চ বিন্যাস)
iii. Restriction on feeding and social Intercourse (খাদ্য গ্রহন ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা)
iv. Civil and Religious Disabilities and Privileges of Different sections. (বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা)
v. Restrictions on Marriage (বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ)
vi. পেশা নির্বচনের ক্ষেত্রে পছন্দ ও অপছন্দের সীমাবদ্ধতা।

(i) **Segmental Division:-** Segmental Division হল জনসংখ্যাকে গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা। এটি সামাজিক Grouping তৈরি করে কিন্তু লেবেল নয়। এটি জন্মের উপর ভিত্তি করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রবাহিত হয়। সদস্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সদস্যের স্থির অবস্থা, ভূমিকা এবং কাজ রয়েছে। জাতির সদস্যপদ অপরিবর্তনীয়, হস্তান্তরের অযোগ্য এবং দুষ্প্রাপ্য। জি.এস ঘুরে জাতি ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী সমাজের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

(ii) **Hierarchy:-** মূলত হিন্দু সমাজ ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যাস্ত। প্রতিটি জাতি একাধিক খন্ডে বা উপাদলে বিভক্ত এবং ক্রমোচ্চ বিন্যাসের ফলে সামাজিক অথবা শ্রেষ্ট ও নিকৃষ্ট কাঠামোর জাতিগোষ্ঠী গুলি উচ্চ
ও নিম্নস্থান অধিকার করে এবং ক্রমোচ্চ বিন্যাসের নিতী অনুসারে ব্রাহ্মণরা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে এবং ব্রহ্মণরা হল শুদ্ধ জাতি গোষ্ঠী অপর দিকে অস্পৃশ্য শুদ্ররা সমাজে অপবিত্র হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সমাজে তাদের স্থান সর্বনিম্নে। প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে, এটি তার নিজস্ব

Scanned with CamScanner

সদস্যদের কার্যকলাপ আচরণ, মনোভাব, উপলব্ধি পরিচালনা করার জন্য নিজস্ব নিয়ম প্রনয়ণ করে। শুদ্রদের জন্য নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞামূলক নিয়ম বেশি ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের মতো শ্রেণীবিন্যাসের মাঝামাঝি সীমাবদ্ধ নিয়মে কঠোরতা বা চিত্র ছিল না। কিন্তু আবার ব্রহ্মণদের মতো উচ্চ বর্ণের জন্য সীমাবদ্ধ নিয়ম শক্তিশালী করা হয়েছিল।

(iii) **Restriction on feeding and social Intercourse:-** অধ্যাপক ঘুরে জাতিপ্রথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, খাদ্য ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে সমস্ত বর্ণের মানুষের উপর কিছু নিয়ম বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ভারতীয় সমাজে খাদ্য গ্রহন এবং সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে এখনও বিধিনিষেধ প্রচলিত রয়েছে। খাদ্য ও পানীয় গ্রহনের ক্ষেত্রে কিছু জাতি গোষ্ঠী জল চল ও জল অচল বলে চিহ্নিত হতে হয়। শুদ্ধ ও অশুদ্ধের নীতির দ্বারা একটি জাতি অপর জাতির থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। জল চল জাতি সমূহের কাছ থেকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহন করা যায়, কিন্তু আবার জল অচল জাতি সমূহের কাছ থেকে কখনই খাদ্য ও পানীয় গ্রহন করা যায় না। অধ্যাপক ঘুরে গবেষনা করে বলেন যে, প্রত্যেক জাতির সদস্যরা একে অপরের থেকে কাঁচা খাবার অর্থাৎ জল ও নুনের দ্বারা তৈরি খাবার গ্রহন করতে পারবে। তবে উচ্চ জাতি বিশেষত ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র পাকা খাবার (ঘি দ্বারা প্রস্তুত বা রান্না করা খাবার) ও লবন বর্জিত খাবার নিচু জাতির সদস্যদের কাছ থেকে গ্রহন করেন। তবে কোন জাতিই অস্পৃশ্যদের হাতের ছোঁয়া জল ও খাদ্য গ্রহন করে না।

এছাড়াও হিন্দু সমাজ ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যাস্ত হবার ফলে মানুষের অধিকার ও কর্তব্যগুলি অসমভাবে বন্টিত করা হয়েছে। এর ফলে সকল জাতি গোষ্ঠীর সদস্যগন অভিন্ন সামাজিক অধিকার, কর্তব্য ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন না। তাছাড়া সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার নিয়ম অনুসারে একজন ব্যাক্তি বিবাহের সময় কেবলমাত্র নিজের জাতি গোষ্ঠী থেকেই বিবাহ হয় অবশ্যই নিজের Sub-Caste থেকে কন্যা পছন্দ করতে বাধ্য থাকেন। পেশা গ্রহনের ক্ষেত্রেও পছন্দ ও অপছন্দের সীমাবদ্ধতা ছিল। অধ্যাপক ঘুরে বলেন যে, ব্রাহ্মণরা সকল সময়ই সকল প্রকার পেশা অবলম্বন করেছেন। যদিও বেশিরভাগ সময় পৌরহিত্য ও শিক্ষাদান করা ছিল ব্রাহ্মণদের একমাত্র পেশা। আবার শুদ্র বা অস্পৃশ্যরা সবচেয়ে অপরিষ্কার কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। যেমন- কাপড়কাচা, চুল কাটা, ড্রেন পরিষ্কার করা বা চামড়ার কাজ বা জুতো তৈরি কর্মে নিযুক্ত থাকতেন।

(iv) **Cities and Civilization:-** অধ্যাপক জি.এস ঘুরে গ্রাম্য নগরায়নের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে গ্রাম থেকেই নগরায়নের শুরু হয়েছিল ১৯৮০ দশক থেকে। ঘুরে বলেন যে, বাজার কেন্দ্রিক চাহিদা থেকে

Scanned with CamScanner

নগরায়নের উৎপত্তি ঘটেছে। প্রচুর পরিমানে উতপাদিত কৃষিজাত পন্য বিক্রয়ের জন্য বড় বড় বাজারের সংখ্যা এবং চাহিদা বেড়েছিল। যার ফলে গ্রামের একটা বড় অংশ Market-এ পরিণত হয়েছিল। তাই অনেক গ্রামীন এলাকায়, একটি গ্রামের একটি অংশ একটি বাজারের কাজ শুরু করে। এর ফলে একটি জনপদ গড়ে ওঠে, যার ফলে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অতীতে, শহুরে কেন্দ্রগুলি সামন্ততান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ছিল, যেখানে সিল্কের কাপড়, গহনা, ধাতব শিল্পকর্ম, অস্ত্র ইত্যাদি চাহিদা ছিল। এর ফলে বেনারস, কাঞ্চিপুরম, জয়পুর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি শহুরে কেন্দ্র গুলির বৃদ্ধি ঘটে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, 'গ্রামীন নগরায়ন'-এর প্রতি অধ্যাপক ঘুরের দৃষ্টিভঙ্গি নগরবাদের আদিবাসি উৎসকে প্রতিফলিত করে। ঔপনিবেশিক সময়ে, মেট্রোপলিটন কেন্দ্রগুলির বৃদ্ধি ভারতীয় জীবনকে বদলে দিয়েছিল। শহর গুলি কৃষিজাত পন্য এবং হস্তশিল্পের দ্বার ছিল না, কিন্তু তারা প্রধান উপাদান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই কেন্দ্র গুলি কাঁচামাল উপাদনের জন্য গ্রামীন এলাকা ব্যাবহার করত এবং শিল্পজাত পন্য বিক্রির বাজারে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে, মেট্রোপলিটন অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটে গ্রামের অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে।

আমরা প্রায়শই বলি যে, Industrial Growth হয়েছিল তাই Urbanisation হয়েছে। আসলে এটা একটা ইউরোপিয়ান ধারনা বা Notion। কিন্তু যদি আমি বলি যে, ভারতবর্ষের গ্রাম যে গ্রামগুলি ধীরে ধীরে বড় হতে হতে Urbanisation এ পরিণত হয়েছে তাহলে এটা হবে ভারততাত্ত্বিক ধারনা বা তত্ত্ব বা ইন্ডোলজি।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner